আসামের জাতিদাঙ্গা বিষয়ে

মন্থন সাময়িকী জুলাই–আগস্ট ২০১২ সংখ্যা

প্রকাশিত হয়েছে

সংগ্রহ করুন

যোগাযোগ : জিতেন নন্দী (০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬)

Vol 4 Issue 7 1 October 2012 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

খবরের কাগজ

সংবাদমন্থন

চতুর্থ বর্ষ সপ্তম সংখ্যা ১ অক্টোবর ২০১২ সোমবার ২ টাকা

• কর্পোরেট–চাঁদা পৃ ২ • ফলতা পৃ ২ • তুতিকোরিন পৃ ৩ • মানেসর ডায়েরি পৃ ৩ • হকার পৃ ৩ • জোড়ামন্দির পৃ ৪ • কংক্রিট–মুক্তি পৃ ৪ • টাকী পৃ ৪

পরমাণুর বিরুদ্ধে জেলেদের নৌবাহিনী

কুডানকুলাম পরমাণু প্রকল্পের বিকিরণের প্রভাবে থাকা মাছ আমদানি বন্ধ করে দেবে ইউরোপীয় বাজার, উজার হবে জেলেদের গ্রামগুলি। তাই প্রায় হাজার জেলেনৌকা অবরোধ করল তুতিকোরিন বন্দর। ২২ সেপ্টেম্বর। ছবি প্রবাকর কাপ্পিকুলম–এর। খবর তিনের পাতায়।

স্পেনের সংসদ ভবনের সামনে হাজার হাজার মানুষ, নয়া সংবিধান ও নয়া রাজনৈতিক কাঠামোর বৈপ্লবিক দাবি নিয়ে। ২৯ সেপ্টেম্বর। ছবি রয়টারের।

জনবিরোধী বাজার–রাজনীতির প্রতিরোধে স্পেনে নয়া সংবিধান পরিষদের ডাক, সংসদ ঘেরাও

শমীক সরকার, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর, ছবি টুইটার ও রয়টার সূত্রে পাওয়া •

আমাদের দেশে যখন সরকার আরেকপ্রস্থ জনবিরোধী পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে, তখন সারা ইউরোপ জুড়েও শুরু হয়েছে নয়া 'কৃচ্ছসাধন' ব্যবস্থা। এদেশের মতোই বিদেশেও 'বাজার অর্থনীতি'কে চাঙ্গা করতে চেয়েই এইসব ব্যবস্থা। তবে আমাদের দেশে কোনও জনবিক্ষোভ দেখা যায়নি, সেসব গড়ে ওঠার জন্য অপেক্ষাও করা হয়নি। সময় নেই, আসন্ন ভোটের কথা মাথায় রেখে সংসদীয় দলগুলির নেতানেত্রীরা প্রেস কনফারেন্স করে জোট ছেড়েছে বা ধরেছে, বনধ্ ডেকেছে, বৈদ্যুতিক চোঙা ফুঁকে সরকারকে গালমন্দ করছে, অথবা 'সংসদীয় জনপ্রতিনিধি'দের নিয়ে ধরনার আয়োজন করে ফেলেছে।

যদিও 'বাজার অর্থনীতি'র সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাবলিক বিরোধী পদক্ষেপ নিতে কোনো দলই কসুর করে না, করার উপায়ও নেই, যদি ক্ষমতার খেলার মাঠে থাকতে হয়। অতি সম্প্রতি তথ্য অধিকার আইনে বেরিয়ে এসেছে, সমস্ত রাজনৈতিক দলের ফান্ডে কর্পোরেট কোম্পানিগুলো কয়েকশো কোটি টাকা করে চাঁদা দিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি চলছে এই চাঁদার ওপর দাঁড়িয়ে। কংগ্রেস থেকে বিজেপি, সিপিএম থেকে তৃণমূল, সপা থেকে বসপা — কেউই ব্যতিক্রম নয়।

ইউরোপে অবশ্য এই দ্বিচারিতার অধ্যায় শেষ হয়েছে। গত দশকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বারবার বামপন্থী–দক্ষিণপন্থী ক্ষমতা পরিবর্তন হয়েছে, বাজার অর্থনীতির 'সংস্কার', জনবিরোধী পদক্ষেপগুলি থেকে মানুষকে বাঁচানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে। কিন্তু সরকারি জনবিরোধী পদক্ষেপ থেমে থাকেনি।

২০০৪ সালে স্পেনে ক্ষমতায় এসেছিল বামপন্থী জাপাতেরো সরকার। কিন্তু দিনের পর দিন সে দেশের মানুষের হাল খারাপ হয়েছে। এখন ক্ষমতায় দক্ষিণপন্থীরা। গত বছর ১৫ মে স্পেনের প্রায় ৫০টি শহরে বিক্ষোভ হয়, 'আমরা রাজনৈতিক দল ও ব্যাঙ্ককর্তাদের হাতের পুতুল নই' দাবি নিয়ে। সেদিন থেকেই বিভিন্ন শহরের পার্কে তাঁবু খাটিয়ে শুরু হয় 'অকুপাই আন্দোলন'। গণতন্ত্রের এক নয়া উপায়ের খোঁজে শতাধিক 'সাধারণ সভা' বসতে থাকে বিভিন্ন শহরে। রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েতগুলি থেকে ঘোষণা করা হয়, 'তোমরা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করো না'। এই আন্দোলন চলাকালীন একটি ভোট হয়, সেই ভোটে দেখা যায়, স্পেনের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট নষ্ট করা হয়েছে। বছর দুয়েক আগে ঘটে যাওয়া আইসল্যান্ডের আন্দোলনের অনুসরণে স্পেনের 'বিক্ষুব্ধ'–রা আহ্বান করে, নয়া সাংবিধানিক পরিষদ চাই। মাস পেরিয়ে যেতে স্বাভাবিক নিয়মেই সেই জনআন্দোলনে ভাঁটা পড়ে। কিন্তু আন্দোলনের সংগঠন দুশো–র বেশি 'সাধারণ সভা' থেকে যায়, বসতে থাকে নিয়মিত।

এবছর ২৫ সেপ্টেম্বর স্পেনের পার্লামেন্ট ঘিরে ফেলে হাজার হাজার মানুষ। 'উঠে দাঁড়ানোর মঞ্চ' নামে একটি জমায়েত ইন্টারনেটে সামাজিক মিডিয়াতে একটি নয়া সাংবিধানিক প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য আহ্বান রাখে। নাম দেওয়া হয়, '২৫ সেপ্টেম্বর সংসদ দখল'।

এরপর দুই–এর পাতায়

পাট এবার 'বাঁশ' হয়ে যাবে

শমিত, শান্তিপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর •

গোটা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদন হয় নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে। বর্তমানে দর যা দাঁড়িয়েছে, কুইন্টাল প্রতি ১৪০০ থেকে ১৫০০ টাকা, তাতে এবার পাটচাষিদের মাথায় হাত পড়বে। গত মরশুমে চাষি ২০০০–২১০০ টাকা দাম পেয়েছিল প্রতি কুইন্টালে। এবার চাষের খরচ অনেক বাড়লেও পাটচাষির ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর।

শান্তিপুর ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের গুপ্তিপাড়া ঘাট অঞ্চলের গণেশ মণ্ডলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এবছর এক বিঘা জমিতে পাটচাষের খরচা হয়েছে ৫৫০০ থেকে ৬০০০ টাকা। নিজের মজুরি ধরলে খরচ দাঁড়াত ৮০০০ টাকা। এবং পরিশ্রম বাদ দিয়ে একবিঘে জমি থেকে ৫ হাজার টাকার বেশি খরচা উঠবে না এবার।

জানা গেল, বিঘা প্রতি নিজেদের পরিশ্রম বাদে লোকসান প্রায় হাজার দুই তিন। এবছর স্বাভাবিকের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম হওয়ায়, পাট কাটার খরচ অনেক বেড়ে গেছে। পাট কাটা ও তারপর জলে ফেলে পচানোর খরচ হয়েছে বিঘে প্রতি আঠারোশো টাকা। চাষের খরচ না ওঠায় চিন্তায় চাষির মাথায় হাত পড়েছে। এবছর বোরো ধান চাষ করে চাষি লাভের মুখ দেখেনি। তারপর পাটচাষেও এই অবস্থা। চাষিরা যাবে কোথায়? এবছর নদিয়াতে আগস্ট পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের ঘাটতি ছিল ১৬ শতাংশ। তারপর সামান্য বৃষ্টিপাত হয়েছে। খাল বিল নয়ানজুলিগুলিতে জল যথেষ্ট কম থাকায় চাষিদের পাট পচাতে যথেষ্ট বিপাকে পড়তে হয়েছে। শান্তিপুর ব্লকে প্রায় আশি থেকে নব্বই শতাংশ জমিতে পাটচাষ হয়। বৃষ্টিপাত কম হওয়ার জন্য চাষিরা পাট কেটেছেন বেশ দেরি করে। ঘরের কাছে জল না হওয়ায় পাট পচানোর খরচ এবছর দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে পাট ১০০ থেকে ১১০ দিনের মধ্যে পচাতে দেওয়ার কথা সেখানে কোথাও কোথাও ১৫০ থেকে ১৭০ দিন জমিতে পাট রয়ে গিয়েছিল। অথচ পাট কেটে অন্য শস্য বোনার দিনও ক্রমশ এগোতে থাকায় জল না পেয়ে তড়িঘড়ি পাট কেটে জমিতে গাঁট বেঁধে পড়ে রইল বেশ কিছু দিন। দ্বিগুন খরচ দিয়েও এবার জলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেই হবে। পাট পচাতে জল লাগে সাধারণত বিশ–পঁচিশ দিন, প্রতি কেজি পাট পচাতে জল লাগে ৩০–৩৫ লিটার।

রাসায়নিক পদ্ধতিতে পাঁচ থেকে দশদিনের মধ্যে ২–৩ লিটার জলে রাসায়নিক মিশিয়ে পাট পচানো যায়। কিন্তু সেই কারিগরি ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে না প্রায় কোনো চাষি। এক সপ্তাহের মধ্যে নব্য কারিগরিতে যেখানে চাষির ঘরে পাট উঠে যাওয়ার কথা, সেখানে প্রতি বছরই পাট নিয়ে বিপাকে পড়তে হয় চাষিকে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অন জুট অ্যান্ড অ্যালায়েড ফাইবার টেকনোলজি কারিগরি কি সোনালি তন্তুর কোনো সুসংহত সমাধান করতে পারে না? রাজ্য কৃষি ও জুট সংস্থার কর্তাদের কি এ ব্যাপারে কোনো দায়িত্বই নেই?

সে কারণে গণেশ মণ্ডলের মতো বহু চাষির আক্ষেপ, পাট এবার 'বাঁশ' হয়ে যাবে।

দাঙ্গা–বিধ্বস্ত বড়োভূমিতে

দাঙ্গা বিধ্বস্ত আসামে বাঙ্গালিরা কেমন আছেন?

জিতেন নন্দী, বঙ্গাইগাঁও, ১৬ সেপ্টেম্বর •

গুয়াহাটি থেকে বঙ্গাইগাঁও নয়দিনের সফরের পর আজ আমরা কলকাতা ফেরার অপেক্ষায়। নিউ বঙ্গাইগাঁও স্টেশনের রিটায়ারিং রুম থেকে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। গত কয়েকদিন আমরা বড়োল্যান্ড স্বশাসিত অঞ্চলের তিনটি জেলায় ঘুরেছি — কোকরাঝাড়, চিরাং, বঙ্গাইগাঁও। কেবল উদালগুড়ি জেলায় আমাদের যাওয়া হয়নি। শরণার্থীদের শিবিরে শিবিরে ঘুরতে ঘুরতে বড্ডো অসহায় লাগছিল। মহিলারা নিজের ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসার বৃত্তান্ত বলতে বলতে কেঁদে ফেলছিল। শেষের দিকে চিরাংয়ের কাউয়াটিকা গ্রামে একজনের মুখে তাঁর নিজের ছেলে এবং মামাতো ভাইয়ের কোতল হওয়ার খবর শুনে আমাদেরই পালিয়ে আসতে ইচ্ছে করছিল। শিবির পরিদর্শনের এমন বিড়ম্বনা সহ্য করা মুশকিল।

শেষদিন তাই আমরা উদ্দেশ্যহীনভাবেই বেরিয়ে পড়লাম। হেঁটে হেঁটে গেলাম শান্তিপাড়া, ঝিলকাঝাড় পর্যন্ত। বিস্তীর্ণ সবুজের বুকে ছোটো ছোটো গ্রাম। দূরে পাহাড়ের সারি। আজ দিনটাই মেঘলা। ঝিলকাঝাড় রাজবংশী অধ্যুষিত গ্রাম। এর পরেই ডাংতল গ্রাম, সেখানে আছে বড়োরা। মুসলমানরা এখন সেখানে যেতে ভয় পায়। মাঝে নতুনপাড়া। সেখানে রয়েছে দুনিয়াপাহাড় শ্মশান। হাঁটতে হাঁটতে শান্তিপাড়া থেকে ফেরার সময় দেখলাম, এক জায়গায় কাঠের চুল্লিতে শব দাহ করা হচ্ছে। (প্রথম ছবি)

স্থানীয় মুসলমানরা এই শ্মশানকে হিন্দুদের বলেই জানে। কিন্তু একটু খোঁজ করে জানলাম, এই শ্মশানে কোচ, রাজবংশী, সাঁওতাল, হিন্দু বাঙালি সকলেরই দাহ হয়। কাছারি, নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে শিবগোত্রের মানুষেরও দাহ হয়।

আমরা যাওয়া–আসার পথে দু–বারই একটা চায়ের দোকানে বসে লম্বা আড্ডা মারলাম। লাল চা খেতে খেতে কথা হল বহু মানুষের সঙ্গে। এখানে সবাই বাঙালি মুসলমান। তাদের মুখে মিষ্টি বাঙাল ভাষা। চায়ের দোকানি মধ্যবয়স্ক মানুষ, নাম আবদুল মজিদ। লাগোয়া ঘরে ওঁর বউ, ছেলে আর ছোট্ট মেয়েও রয়েছে। মজিদ বললেন, আগে তিনি নাকি সর্দারি করতেন। সর্দারি মানে সাব–কন্ট্রাক্টারি। এখন চায়ের দোকান আর কিছু জমি অন্য বাঙালি হিন্দুর কাছ থেকে নিয়ে চাষ করেন। শুধু এটুকুই নয়, বললেন, 'আরও ব্যবসা আছে'।

কীসের ব্যবসা? ভেঙে বললেন না। সকালে যাওয়ার সময় একজন মানুষ মজিদের দোকানের সামনে মোটরবাইক রেখে গরু খুঁজছিলেন। সকলকে জিজ্ঞাসা করতে করতে দেখলাম শান্তিপাড়া গ্রামে গিয়ে সেই গরু উদ্ধার হল। গরুটাকে টেনে নিয়ে আসা হল। আমি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কুরবানির গরু নাকি?' তিনি মাথা নাড়েন, 'কিছু ঠিক নেই'।

এরপর দুই–এর পাতায়

মুহাম্মদ হেলালউদ্দিন, আসাম থেকে ফিরে, ২৬ সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় ছবিতে ত্রাণশিবিরে রান্না •

অসমে জাতিদাঙ্গা ভাষাদাঙ্গা যেন গা–সওয়া ব্যাপার। ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচরে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনে ১ জন মহিলা সহ ১১ জন শহিদ হয়েছিলেন। অসমের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার ঘরছাড়া বাঙালি পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। এবারেও পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী শিবিরে কয়েক হাজার বাঙালি আশ্রয় নিয়েছে। অসমে ভাষাদাঙ্গা বা বাঙালি হটাও আন্দোলন হয়েছে, অশান্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।

১৩ সেপ্টেম্বর আমি, রামজীবন ভৌমিক, জিতেন নন্দী, কামরুজ্জামান কোকড়াঝাড়ে গিয়েছিলাম। স্টেশনের ও শহরের সব জায়গায় পোস্টার সাঁটা আছে। পোস্টারে লেখা ছিল বাংলাদেশিদের বয়কট করো নয়তো শাস্তি দেওয়া হবে। তাদের কোনোরকম কাজ দেওয়া হলে ১০০০০ টাকার জরিমানা করা হবে। বাঙালিরা বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানেরা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে।

২৬ সেপ্টেম্বর ফোনে কথা হয় আব্দুল মালেকের সঙ্গে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, কর্মসূত্রে অসমের কোকড়াঝাড় শহরে সোনার কারবার করেন। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের যারা অসমে স্বর্ণশিল্পের কাজ করত বিটিসি এলাকায়, তারা কাজ হারিয়ে ফিরে আসছে বাংলায়। কেউ কেউ আবার অসমে ফিরে গেলেও দোকান পসার খুলতে পারছে না। আমি সপরিবারে বাস করি শহর থেকে তিন কিমি ভেতরে। ২১ জুলাই প্রাণটি নিয়ে কোনোরকমে পশ্চিমবঙ্গে নিজের বাড়িতে চলে আসি। কয়েকদিন থাকার পরে আবার ফিরে যাই। কিন্তু দোকান খুলতে পারছি না। আমার বাড়ি হুগলি জেলার সিঙ্গুর থানার দিয়াড়ায়।

এরপর দুই–এর পাতায়

সম্পাদকের কথা

কুডানকুলাম নিয়ে বিদেশি চক্রান্তের গল্প ফাঁদতে চাইছে দিল্লির সরকার

শনিবার একটা ছোট্ট খবরে চোখ আটকে গেল। চেন্নাই বিমানবন্দরে অবতরণের পর জাপানের তিন নাগরিককে দেশে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। এঁরা কুডানকুলামে যাচ্ছিলেন। তামিলনাড়ুর কুডানকুলামে এক দীর্ঘ এবং অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন চলছে। দাবি একটাই — পৃথিবীর পক্ষে চূড়ান্ত ক্ষতিকারক পরমাণু চুল্লি বসানো চলবে না।

এর আগেও জাপানের পরমাণু দুর্ঘটনার শহর ফুকুশিমা থেকে এক মহিলা ভারতে আসার অনুমতি চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ঠিক এইভাবেই এক জার্মান নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কেন? এই বিদেশিরা কি আমাদের দেশের শত্রু? তাঁরা কি আমাদের কোনো ক্ষতি করতে আসছিলেন? এরকম কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। ভারত সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের একটাই তথ্য — এঁরা পরমাণু শক্তির বিপক্ষে। এঁরা পৃথিবী নামক গ্রহ এবং তার পরিবেশকে বিষাক্ত হতে দিতে চান না। এটাই এঁদের অপরাধ!

অথচ এটা কোনো অপরাধের বিষয় নয়। এ নিয়ে মনমোহন সিং বা তাঁর সরকারের কিছু বিজ্ঞানীর দ্বিমত থাকতে পারে। তাঁরা মনে করতেই পারেন যে, পরমাণু শক্তি এবং তার উৎপাদন-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ। কিন্তু এই মত সর্বসম্মত নয়। শনিবার জাপানিদের ফিরিয়ে দেওয়ার মাত্র চব্বিশ ঘন্টা আগেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছে, কুডানকুলাম পরমাণু প্রকল্পের নিরাপত্তা সন্তোষজনক না হলে প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে।

যেখানে খোদ সুপ্রিম কোর্টের পরমাণু প্রকল্পটির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, সেখানে মনমোহন সিং এবং তাঁর গোয়েন্দা বিভাগ এত নিশ্চিন্ত এবং আক্রমণাত্মক কেন? কেন তাঁরা বিতর্কিত রাশিয়ান চুল্লিটা চালু করার জন্য এত মরিয়া? তাঁদের অন্য কী বাধ্যবাধকতা আছে, জানি না। কিন্তু এটা জানি, তাঁরা পরমাণু শক্তি নিয়ে জাপানের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখতে চান। জাপানিদের সেই অভিজ্ঞতা থেকে তামিলনাড়ু, কুডানকুলাম কিংবা ভারতের মানুষ শিখুক, এটা তাঁদের মনঃপুত নয়।

বড়ো বাণিজ্যিক মিডিয়াকে ব্যবহার করে মনমোহন সিং অ্যান্ড কোম্পানি (নাকি কোম্পানি অ্যান্ড মনমোহন সিং!) একটা বিদেশি ধুয়ো তুলতে চাইছে, একটা চক্রান্তের গল্প ফাঁদতে চাইছে। পরমাণু শক্তির ভালোমন্দ নিয়ে দেশের মানুষ খতিয়ে দেখুক, এটা ওরা একদমই চাইছে না।

প্র থ ম পা তা র প র

জনবিরোধী কর্পোরেট–রাজনীতির প্রতিরোধে নয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার দাবি স্পেন–এ

কিন্তু কারা এই আহ্বান রাখল এবং ঠিক কীই বা তারা চায়, সেই বিষয়ে পরিষ্কার চিত্র না থাকা এবং স্বচ্ছতার অভাবের কারণে ওই সাধারণ সভাগুলির মধ্যে খানিকটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়, ব্যাপক বিতর্ক হয়। কিছু সাধারণ সভা এটা সমর্থন করে, কিছু করে না। সমর্থনকারী সাধারণ সভাগুলিকে নিয়ে তৈরি হয় 'কোওর্দিনেদোরা ২৫এস', সাধারণ সভার মাধ্যমে তৈরি হয় সম্পূর্ণভাবে অহিংস 'সংসদ ঘেরাও' অভিযান। ঠিক হয়, পার্লামেন্টের কাজকর্ম বন্ধ করা হবে না, পার্লামেন্টে ঢুকতে বেরোতে কাউকে বাধা দেওয়া হবে না। ব্যানার থাকে, গণতন্ত্রকে অপহরণ করেছে রাজনৈতিক দল, বাজার, ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়ী, আইএমএফ, বিশ্বব্যাঙ্ক, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। ইস্তেহার লিখে দাবি জানানো হয়,

- *সরকার, কোর্ট এবং রাষ্ট্রের নেতৃত্বের অপসারণ*
- *নয়া সংবিধান, সমস্ত মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে তৈরি হওয়া*
- *সমস্ত ঋণের অডিট, এবং সত্যিকারের জনগণের ঋণ এবং ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ঋণকে আলাদা করা। কেবল জনগণের ঋণকেই জাতীয় দায় হিসেবে নেওয়া*
- *নির্বাচনের আইন সংস্কার, যাতে তা সত্যিকারের জনপ্রতিনিধি বাছতে সক্ষম হয়, সেই বন্দোবস্ত করা*
- *সমস্ত 'কৃচ্ছসাধন' অবিলম্বে বাতিল করা*
- *নয়া রাজস্ব ব্যবস্থা, ধনীদের ওপর বেশি ট্যাক্স, বকেয়া কর মকুবের ব্যবস্থা বাতিল করা*
- *সমস্ত রকমের বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ বাতিল করা*
- *সহনীয়তার ওপর দাঁড়িয়ে, মানবতার উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে নয়া চাকরি তৈরি।*

পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে মানুষের শান্তিপূর্ণ জমায়েতে ২৫ সেপ্টেম্বর পুলিশ ব্যাপক অত্যাচার চালায়। এমনকী রাবার বুলেটও ব্যবহার করা হয়। বহু প্রতিবাদকারী আহত হয়। এতে দমে না গিয়ে ফের ২৬ সেপ্টেম্বর জমায়েত হয় মানুষ, পার্লামেন্টের বাইরে নেপচুনো স্কোয়ারে জমায়েত হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর পার্লামেন্টে একটি 'কৃচ্ছসাধন'-এর বাজেট পেশ হয়। ফের বাইরে জমায়েত হয় মানুষ। পুলিশ জানায় জমায়েতের সংখ্যা সাড়ে চার হাজার, সংগঠকদের মতে তা বহুগুণ বেশি। সারাদিন জমায়েতের পর মাঝরাতে ব্যাপক পিটিয়ে জমায়েত ভাঙে পুলিশ। কিন্তু ওই একইদিন, অর্থাৎ ২৯ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ইউরোপের অন্যান্য দেশ — পর্তুগাল, গ্রীস এবং ইতালিতেও বাজার–সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে নিজ নিজ দেশের সংসদ ঘেরাও অভিযান হয়। হল্যান্ড এবং বেলজিয়ামের মানুষ স্পেনের মানুষের সমর্থনে ২৯ অক্টোবর রাস্তায় নামে।

পর্তুগাল এবং গ্রীসের বাজার অর্থনীতিরও বেহাল দশা। গ্রীসে গত বছর তৃতীয় দফার জনবিরোধী 'কৃচ্ছসাধন' প্রকল্প আনার পর ব্যাপক জনবিক্ষোভে সরকার পদত্যাগ করেছিল, ভোট হয়েছিল। এবছর মাস কয়েক আগে সেই দু-দফার ভোটে কৃচ্ছসাধনের পক্ষে থাকা একটি দল কোনোক্রমে জয়ী হয়। যাই হোক, গ্রীসের ব্যাপক জন আন্দোলন চলছিলই। পর্তুগালেও গত কয়েকবছর ধরেই চলছে জন আন্দোলন। তবে স্পেনের আন্দোলনের থেকে কিছুটা আলাদা এই গ্রীস ও পর্তুগালের আন্দোলন, এখনও সেখানকার আন্দোলনের মূল সংগঠনগুলি হল কিছু রাজনৈতিক দল এবং বড়ো বড়ো ট্রেড ইউনিয়ন। সরাসরি 'সাধারণ সভা'র মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বন্দোবস্ত সেখানে নেই।

শেষ খবর, কৃচ্ছসাধনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলি ইউরোপ জুড়ে প্রতিবাদের বন্দোবস্ত করেছে। ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি প্রভৃতি দেশে। অকুপাই আন্দোলনের সংগঠন 'অ্যাডবাস্টার' পত্রিকা ৩১ অক্টোবর আমেরিকায় সংসদ ভবন ক্যাপিটল হিলের সামনে 'হ্যালোউইন পার্টি'র ডাক দিয়েছে।

বাজার–রাজনীতির উৎস : দল চলে কর্পোরেটের চাঁদায়

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর • সম্প্রতি অ্যাসোসিয়েসন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস্ তথ্য অধিকার আইন মারফত নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আয় ও সম্পদের পরিমাণ ও উৎস জানতে পেরেছে। সেগুলি তারা প্রকাশ করেছে ১০ সেপ্টেম্বর। তার তথ্য পাওয়া যাবে এখানে, http://adrindia.org/sites/default/files/Report donations.pdf দলগুলির আয়ের উৎস কী, তা খতিয়ে দেখার সুযোগ নেই। তাই তারা যা জানিয়েছে কমিশনকে এবং যে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিয়েছে কমিশনে, তার ভিত্তিতেই এসব জানা যাচ্ছে।

কংগ্রেস সবচেয়ে বড়োলোক দল, ২০১০–১১ সালে তাদের আয় ৩০৭ কোটি টাকা। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির আয় প্রায় এর অর্ধেক (১৬৮ কোটি), তারপর আছে বিএসপি (১১৫ কোটি)। যাই হোক, কংগ্রেসের দাবি, এই আয়ের ৮৫ শতাংশই এসেছে কুপন বিক্রি করে। একইরকম দাবি এনসিপি দলেরও। অর্থাৎ কে ভালোবেসে ক–টা কুপন কিনল, তা জানানোর দায় তাদের নেই। বাকি চোদ্দ শতাংশ ডোনেশনের আয়। বিজেপি অবশ্য এই লুকোছাপা করেনি। তারা জানিয়েছে, তাদের আয়ের ৮১ শতাংশই এসেছে ডোনেশন থেকে। বিএসপি, এসপি, সিপিআই, সিপিএম দলগুলির আয়ের কমবেশি অর্ধেক ডোনেশন থেকে। এআইএডিএমকে, ডিএমকে, জেডিইউ, আরজেডি, তৃণমূল, শিবসেনা, লোকজনশক্তি দলগুলির অর্ধেকের অনেক বেশি ডোনেশন থেকে আয়। তবে কর্পোরেট ডোনেশন পাওয়ার ব্যাপারে দুই বড়ো পার্টি, কংগ্রেস এবং বিজেপি অনেক এগিয়ে। অবশ্যই, বিজেপির থেকেও অনেক এগিয়ে কংগ্রেস।

এই ডোনেশন দাতাদের মধ্যে আছে, আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর জেনারেল ইলেক্টোরাল ট্রাস্ট, টোরেন্ট পাওয়ার গোষ্ঠী (১৯৯৭ সালে আমেদাবাদের বিদ্যুৎ নিগমে গুজরাট সরকারের ৩০ শতাংশের মতো শেয়ারের পুরোটা বাগিয়ে নিয়েই এই নয়া কর্পোরেটের উত্থান শুরু। খাতায় কলমে দেশি এই কর্পোরেটের প্রাথমিক পুঁজির প্রায় পুরোটাই মার্কিন দেশের এক লগ্নিসংস্থা, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনের), ভারতী–র ইলেক্টোরাল ট্রাস্ট (এদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে ওয়ালমার্ট অনেকদিন ধরেই ভারতের হোলসেলিং বাজারে ঢুকে পড়েছে), টাটা গোষ্ঠী, মিত্তাল গোষ্ঠীর ইলেক্টোরাল ট্রাস্ট, বেদান্ত–স্টারলাইট গোষ্ঠী (আদিবাসী ভূমিতে বক্সাইট মাইনের কারণে কুখ্যাত), আইটিসি, আদানি গোষ্ঠী, জিন্দাল স্টিল, ভিডিওকন, এশিয়ানেট টিভি, অম্বুজা সিমেন্ট, মাহিন্দ্রা, এসইডবলু, লারসেন টুবরো, ভারত ফোর্জ, রোহন প্রোমোটার, কেএসকে এনার্জি, হিন্দুস্তান কনস্ট্রাকশন, ক্রম্পটন গ্রিভস, ডেম্পো, সালগাওকর, ইউনাইটেড ফসফরাস, বালাজি অটো, কল্যাণী গ্রুপ, এসার, ডিসম্যান ফার্মাসি, ইনফিনা ফাইনান্স, মুন্দ্রা পোর্ট সেজ, বল্লারপুর ইন্ডাস্ট্রিজ, শ' ওয়ালেশ, ক্যাডিলা, ভারত হোটেল, স্কাই অ্যাপ্লায়েন্স, বাজাজ অটো, নিপ্পন, জেপি ভেঞ্চার, কোটাক মাহীন্দ্রা প্রভৃতি। এর মধ্যে বেশিরভাগই একাধিক পার্টিকে ডোনেশন দেয়। বোঝাই যায়, সরকারি–বিরোধী রাজনীতিকে নিজেদের ব্যবসায়িক কাজে লাগানোর জন্যই এত তোড়জোড়।

এই তথ্য অধিকার আইনে আরও কিছু তথ্য পাওয়ার জন্য দলগুলিকে গত সপ্তাহে শুনানিতে ডেকেছিল কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন। এনসিপি এবং সিপিআই ছাড়া কেউ তাতে হাজির হয়নি।

প্র থ ম পা তা র প র

দাঙ্গা–বিধ্বস্ত বড়োভূমিতে

আমরা যখন ফিরছি, ওই চায়ের দোকানেই একজন যুবক এসে ওই গরু কেনার জন্য মোটরবাইক আরোহীর সঙ্গে দর কষাকষি করছিলেন। এগারো হাজার থেকে নামতে নামতে পাঁচ হাজার দুশো পর্যন্ত নামলেন গরুর মালিক। আমরা অন্য আলাপে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে দেখলাম, মোটরবাইক স্টার্ট দিয়ে লোকটি চলে গেলেন। যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হল, রফা হল না?' তিনি বললেন, 'পাঁচ হাজার একশো টাকা দিচ্ছিলাম, উনি রাজি হলেন না। আসলে একজনের বাড়িতে বিয়ে আছে, গরুটা লাগত।' এর আগে লক্ষ্য করলাম, দোকানদার মজিদ আমাদের সামনে গরুর এই দরাদরি পছন্দ করছিলেন না। সেটা প্রকাশ করাতে গরুর মালিক বেশ রেগে গিয়েছিলেন।

মজিদ এবং দোকানের অন্য খদ্দেররা বলছিলেন, এবার মাঠে শালিধানের ফলন ভালো হয়েছে। শালিধান মানে আমাদের চেনা ধান আমন। এখানেও অধিক ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার আর ওষুধের ব্যবহার একইরকম রয়েছে। মজিদ অধিক ফলনশীল রঞ্জিত বীজের পাশাপাশি দেশি বীজও অল্প লাগিয়েছে। তাতে ফলন কম। তাঁর আশা, রঞ্জিত বীজে বিঘাপ্রতি দশ–বারো মণ ধান হবে। এখানে চায়না বীজ নামে একটা বিদেশি ভ্যারাইটি আছে। মজিদ বলেন, 'ঠিক মতো করতে পারলে ওর ফলন বিশ মণ।'

বহু চাষের জমি ফাঁকাও পড়ে রয়েছে। চাষ হয়নি। মজুর খাটার লোক পাওয়া যায় না। মাঠে ১২০ টাকা মজুরি, সেখানে টাউনে খাটতে গেলে ২০০ টাকা পাওয়া যায়।

বড়োদের পাড়ায় মুসলমানদের এখন যাতায়াত নেই। জুলাই মাসে দাঙ্গার পর থেকে এই অবস্থা চলছে। এখনও নাকি বড়োদের পাড়ায় মুসলমান লেবারদের কাজ দেওয়া হচ্ছে না। মুসলমান মানেই এখন 'বাংলাদেশি'। চতুর্দিকে পোস্টার পড়েছে, 'বাংলাদেশিদের কাজ দিলে দশ হাজার টাকা ফাইন'।

মজিদ বলছিলেন, বড়োদের খাওয়ার কোনো বিচার নেই। ওরা রাক্ষস, সব খায়। পোকামাকড়, এমনকী দাঁড়াস সাপ পর্যন্ত খায়। ওদের মধ্যে অনেকেই চাষের কাজ জানে না। হালবলদ করতে চায় না। ধান যদিও বা লাগায়, সবজি চাষ একদম জানে না। আড্ডায় অন্যরাও যোগ দেয়। জানা যায়, বড়োরা মারা গেলে মুখাগ্নি করে নদীর তীরবর্তী জায়গায় পুঁতে দেওয়া হয়। মুসলমানেরা গোরস্থানে মাটি খুঁড়ে ঘর তৈরি করে কবর দেয়। বড়ো খ্রিস্টানরাও কবর দেয়। কোচ রাজবংশীরা পোড়ায়। রাভারা মাটিতে পুঁতে দেয়। সাঁওতালদের রীতি এরা জানে না।

কোকরাঝাড়ে রুইসুমোই হোটেলে আমরা দেখেছি, খাসি মুরগি আর শুয়োরের মাংস পাওয়া যায়। তবে ডিম পাওয়া যায় না। যাই হোক, খাদ্যাভাসের এসব ফারাক তো জাতিতে জাতিতে বরাবরই ছিল। কিন্তু এমন তীব্র সংঘাত ছিল না।

এখন মজিদদের চোখে বড়োদের অনেক কিছুই খারাপ। বড়ো বা মুসলমান সকলের মনেই দাঙ্গার ঘা এখনও দগদগে। পাশাপাশি বাস করা দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখন একটা স্পষ্ট ফাটল। অথচ তাঁরা এটাও বললেন, জুলাই মাসের আগে তাঁদের মধ্যে একসঙ্গে ওঠাবসা খাওয়াদাওয়া সবই ছিল।

প্র থ ম পা তা র প র

আসামে বাঙালিরা কেমন আছে

আমাদের গ্রামের নুর হোসেন কোকড়াঝাড় শহরে সিটি জুয়েলার্সে পালিশের কাজ করত। সে এখনও কোকড়াঝাড়ে ফিরতে পারেনি। একই অবস্থা হুগলি জেলার চণ্ডীতলা থানার মঙ্গলপাড়ার সেলিমের। সে সোনা পালিশের কাজ করত ভদ্র জুয়েলার্সে।

অসমে পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে কোচবিহারের বহু মানুষ বাস করত। তারা সব পালিয়ে গিয়েছে। অসমের ধুবড়ি জেলার বহু বাঙালি নানান কাজকারবার করত কোকড়াঝাড়ে। তারা অর্থাৎ বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানেরা পালিয়ে গিয়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। দুমাসেরও বেশি সময় ধরে তারা ত্রাণ শিবিরেই রয়েছে, ফিরতে পারছে না। বড়োদের কাছে এখন বাংলাভাষী মুসলমান মানেই বাংলাদেশি। তারা কি ফিরতে পারবে কাজের জায়গায়? কে দেবে তাদের নিরাপত্তা? আমি কোনো কাজ পাচ্ছি না। দোকান খুলতে পারছি না। সংসারের অবস্থা করুণ। এমন করে আর কতদিন চলবে? শহর থেকে দূরে গ্রামের দিকে থাকি। এখন ভয়ে আতঙ্কে সিঁটিয়ে আছি।'

ফলতা সেজ–এ মজুরি বৃদ্ধির কিসসা

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ফলতা, ৩০ সেপ্টেম্বর • ফলতা স্পেশাল ইকনমিক জোনের লেবারদের মিনিমাম ১৭০ টাকা দিতে হবে এরকম একটা কথা বাজারে চাউর হতে থাকে এই বছরের প্রথম দিক থেকেই। একই সঙ্গে বাইরের সমস্ত কাগজেও একথা প্রচার হয়ে যায়। কিন্তু ডেল্টমল আর সীমল এই দুটি কোম্পানিতে নানা ঝুটঝামেলা করে লেবাররা। তাই এই কোম্পানিগুলো নতুন রেট দিতে শুরু করলেও অন্যান্য কোম্পানিগুলি তা দেয়নি।

এই বর্ধিত মজুরি না দেওয়া নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই অসন্তুষ্টি ছিল। কিন্তু কেউ সরাসরি তা প্রকাশ করেনি। ১৩ আগস্ট সকালে LTS কোম্পানির লেবাররা অন্যান্য দিনের মতোই কাজে ঢোকার পর সকলে একজোট হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, আজ আর কেউ কাজ করবে না। সবাই কারখানা গেটের বাইরে চলে আসে। অবস্থান করতে থাকে। তারপর সবাই মিলে সিদ্ধান্ত করে DC অফিসে যায়। সেখানে লেবারদের প্রতিনিধি হিসাবে অলোক এবং অন্যান্য কিছু লেবার কথা বলতে যায়। সেদিন কথাবার্তা তেমন একটা এগোয়নি, লেবাররা বিকেলে যে–যার মতো ঘরে চলে যায়। ১৪ তারিখে সেই একই অবস্থা চলতে থাকে। এর মধ্যে মালিকের লোকজন এই কথা ছড়াতে থাকে যে, এখন এই সব নিয়ে ভাবলে চলবে না, কারখানার ভেতর ঢোকা মুশকিল হবে, তাড়াতাড়ি কাজে ঢুকে যাওয়া ভাল।

এইভাবে ১৪ তারিখ কেটে যায়। কিন্তু প্রায় ৫০০ জন কাজে যোগ দেয়নি। যদিও যারা গরিব (এখানকার স্থানীয় লোক অনেকেই এখানে কাজ করত) তাদের অনেকেরই বাড়িতে এমন অবস্থা যে, এখানে টাকা না পেলে সংসার চলবে না। তাই এরা চাইছিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সমস্যাটা মিটে যায়। অন্যদিকে লেবাররা সবাই মিলে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করে কারখানার সামনে। এরপর ১৬ তারিখে দেখা যায়, একটা কন্টেনার ভর্তি করার দরকার হয়ে পরে, কোম্পানিও লেবারদের ওপর কাজ শুরু করার জন্য চাপ বাড়ায়। কিছু লেবার কাজে যোগ দেয়। আবার কয়েকজন বলে খাবার আনিনি, কাল থেকে কাজ শুরু করব। পরদিন গিয়ে তারা শোনে তাদের আর কাজে দরকার নেই, সিকিউরিটি বলে ভিতরে অ্যালাও নেই। কারণ জানতে চাইলে বলে, তা বলতে পারব না।

এইরকম জনাছয়েক লেবার আছে, যারা লেবারদের ওই কয়দিনের আন্দোলনে ভূমিকা নিয়েছিল। আবার এটাও ঠিক যে ওরা যে স্টোর ডিপার্টমেন্টে ছিল তার ঠিকাদার চেঞ্জ হয়েছে, নতুন ঠিকাদার তার লোক দিয়ে কাজ করাবে।

এদের ছ–জনকে কাজ থেকে বাদ দেবার পর আবার পরে এদের মধ্যে দু–জনকে লেবার কন্ট্রাক্টর ডেকে পাঠায়। যে যে কাজ করতে আগ্রহী, তা লিখে তাদেরকে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিতে বলে। ওদের মধ্যে দুজন সেইভাবে অ্যাপ্লিকেশন দেয়। বাকিরা দেয়নি। প্রথমে তারা বলে তারা এটার খবর পায়নি। একজন পরে বলে, ওই কারখানায় ডেলি ১২ ঘন্টা ডিউটি, আবার মাসে ২৪টা ডিউটি না হলে এখন বাকি দিনগুলির জন্য প্রত্যেক দিনের মজুরি ২০ টাকা কম দেয়। তার মধ্যে আবার কাজের একটু এদিক ওদিক হলেই সুপারভাইজাররা বাপ মা তুলে কথা বলে। তাই আর কাজ করতে ঘেন্না এসে গেছে। ওই কোম্পানিতে তারা আর কাজ করবে না।

এরপর তিনের পাতায়

কুডানকুলাম পরমাণু প্রকল্প বাতিলের দাবিতে মৎস্যজীবীদের তুতিকোরিন বন্দর দখল

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ছবি ও তথ্যসূত্র প্রভাকর কাপ্পিকুলম-এর ফেসবুক পেজ, ২২ সেপ্টেম্বর •

প্রায় হাজারখানেক নৌকাতে কয়েক হাজার মৎস্যজীবী বিভিন্ন দিক থেকে এসে তুতিকোরিনের চিদাম্বরম বন্দরের প্রবেশপথ কিছুক্ষণের জন্য দখল নিয়ে নেয় শনিবার ২২ সেপ্টেম্বর। এই প্রতীকী প্রতিবাদে শামিল হয়েছিল তিরুনেলভেলি, তুতিকোরিন এবং কন্যাকুমারি জেলাগুলির মৎস্যজীবীরা। উল্লেখ্য, কুডানকুলাম তিরুনেলভেলি জেলারই অংশ, তুতিকোরিন বন্দর কুডানকুলাম থেকে ৬০ মাইল দূরে। মৎস্যজীবীদের এই প্রতিবাদের সময়ই ব্যাপক নৌবাহিনী এবং রাজ্য পুলিশ জায়গাটি ঘিরে ছিল, আকাশপথে চক্কর দিচ্ছিল নৌবাহিনীর বিমান। এই প্রতিবাদ কর্মসূচি দেখিয়ে দেয়, কুডানকুলামের একটি চুল্লিতে জ্বালানি সংযোগ করা হলেও তাতে মৎস্যজীবীদের প্রতিবাদ বিন্দুমাত্র দমেনি।

তামিলনাড়ুর মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিবাদে যৌক্তিকতা আছে। কারণ, কুডানকুলাম পরমাণু প্রকল্পে কোনো দুর্ঘটনা হলে তার ফলে শহরনিবাসী মন্ত্রী, পরমাণু কর্তা বা আমলাদের বাস্তবত কিছু হবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হবে লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবী। আর যদি কোনো দুর্ঘটনা নাও ঘটে তবুও পরমাণু চুল্লিটির থেকে সমুদ্রের জলে মেশা দূষিত জলের প্রভাবে সমুদ্রের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। মাছ পালিয়ে যাবে গভীর সমুদ্রে। মাছ ধরে যারা দিন গুজরান করে তাদের জীবিকা থাকবে না। কাজ হারিয়ে অচিরেই উজাড় হয়ে যাবে শত শত বছর ধরে সমুদ্রতীরে থাকা হাজার হাজার জেলেপাড়াগুলি।

এই আন্দোলনের সংগঠক 'বিক্ষোভ কমিটি'-র মুখপাত্র সুভাষ ফার্নান্ডো বলেছেন, 'একবার প্রকল্প চালু হলে, এর বিকিরণের প্রভাবে থাকা মাছ আমদানি করা বন্ধ করে দেবে ইউরোপীয় বাজার। যদিও জ্বালানি সংযোগ হয়েছে, তবুও এটাকে বন্ধ করার সময় পেরিয়ে যায়নি।'

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল কুডানকুলামের ইদিনথাকারাই গ্রাম থেকে জানানো হয়েছিল, এবার ব্যাপক প্রতিবাদ সংগঠিত হবে তামিলনাড়ুর বিস্তীর্ণ উপকূল এলাকার মৎস্যজীবীদের নিয়ে। এদিনের আন্দোলনকারীরা ইদিনথাকারাই গ্রাম থেকে পুলিশ সরিয়ে আনা, আন্দোলনকারীদের ওপর থেকে মামলা তুলে নেওয়া এবং বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ১৪৪ ধারা বাতিলের দাবি তোলে।

গত কয়েকমাস জুড়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভারত, চীন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ থেকে মাছ আমদানির ওপর নজরদারি কড়া করেছে। বিভিন্ন ওষুধ দেওয়ার কারণে নিষিদ্ধ হয়েছে এসব দেশ থেকে চিংড়ি আমদানি। এছাড়া বহু দেশ ফুকুশিমা পরমাণু বিপর্যয়ের পর জাপান থেকে 'সামুদ্রিক খাবার' আমদানি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

ধ্বংসের ধ্বজাধারীরা স্বাগত, মানবতার বার্তাবাহকেরা নিষিদ্ধ!

তিন পরমাণু বিরোধী জাপানি নাগরিককে দেশে ঢুকতে দিল না ভারত সরকার!

পরমাণু-মুক্ত ভবিষ্যৎ আমাদের সাধারণ স্বপ্ন

২৫ সেপ্টেম্বর চেন্নাই এয়ারপোর্ট থেকে তিন জাপানি নাগরিক নাকাই শিনসুকে (৪৫), উনদোস ইয়োকো (৪৯), ওয়াতারিদা ম্যাকুলা-কে (৬১) জেরা করে ফেরত পাঠিয়ে দেয় আমাদের দেশের সরকারি কর্তৃপক্ষ। তাঁরা ৩০ সেপ্টেম্বর একটি চিঠি লেখেন ভারতীয় সহনাগরিকদের উদ্দেশ্যে। ডায়ানিউক ডট অর্গ থেকে তার সম্পাদিত বাংলা এখানে দেওয়া হল •

আমরা যখন প্লেন থেকে নামলাম এবং ইমিগ্রেশন কাউন্টারের দিকে এগোলাম, একজন আমাদের দিকে হেসে এগিয়ে এল। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় আমরা ভিসার কাগজ পেতে পারি। সে আমাদের পাসপোর্ট দেখে ইমিগ্রেশন অফিসে নিয়ে এল। সেখানে পাঁচজন আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল।

আমাকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল তিনজন, প্রথমেই প্রশ্ন, আমি জাপানের 'নো নিউক এশিয়া ফোরাম'-এর সদস্য কিনা। আমি অবাক হলাম, তারা সংগঠনের নাম ঠিকঠাক বলে দেওয়ায়। 'তুমি কুডানকুলাম নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক স্বাক্ষর অভিযানে সই করেছ, না?' — জিজ্ঞেস করল তারা। ঠিক তাই, আমরা এবছর মে মাসে আমরা তিনজনেই একটি পিটিশনে সই করেছি। আরেকজন জিজ্ঞেস করল, আমরা কুডানকুলাম গিয়ে কী করব? আমরা আবার অবাক হলাম, এরা কী করে জানলো যে আমরা কুডানকুলাম যাব? কিন্তু লোকটা আমাকে একটা আভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থার টিকিট দেখালো, যা আমিই এখনও চোখে দেখিনি। 'আমরা এর মধ্যেই জেনে গেছি, তোমরা কুডানকুলাম-এর টিকিট কেটেছ। তোমরা সেখানে যাচ্ছ? কে তোমাদের ডেকেছে? কে সেখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবে? কে তুতিকোরিন এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে থাকবে? তাদের নাম আর টেলিফোন নাম্বার দাও।' তারা এরকম অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল এবং অবাক করার মতো ব্যাপার, তারা আমাদের সব ভারতীয় বন্ধুর নাম জানে! আমরা ভয় পেলাম এবং যদি তাদের কোনো বিপদ ঘটে, তাই আমরা তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বন্ধ করলাম। তারা আরও অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগল — 'ওয়াতারিদার মশাইয়ের পেশা কী? উনি তো কামিনোসেকি পরমাণু-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তাই না?'... ওরা আমাদের কাজকর্ম নিয়ে ভালোই গবেষণা করেছে।

প্রথম প্রথম ওরা বন্ধুত্বপূর্ণভাবেই জিজ্ঞাসা করছিল। ওরা বলেছিল, আমরা ভারতে ঢুকতে পারি, যদি আমরা কুডানকুলাম আন্দোলন সম্পর্কে কোনো তথ্য তাদের দিই। কিন্তু আস্তে আস্তে ওরা বিরক্ত হচ্ছিল, তারা চাইছিল যত দ্রুত সম্ভব আমাদের বিদায় করে দিতে। যে প্লেনে আমরা কুয়ালালামপুর থেকে এখানে এসেছি, সেটা আবার ফেরত যাবে। আমরা একঘন্টার বেশি অফিসে। শেষে ওরা বলল, 'আর পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, উত্তর দিন, অথবা আপনাদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' আমরা দু-একটা কথা বললাম, কিন্তু তাতে তারা সন্তুষ্ট হল না, আমাদের নিয়ে চলল ককপিটের দিকে। আমাদের মধ্যে একজন নাকাই, বাথরুমে যেতে চাইল। ওরা যেতে দিল না। আমার মনে হয় ওরা চাইছিল না, আমরা কোনোভাবে আমাদের ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমরাও করিনি, তাতে ওদের বিপদ বাড়ত।

শেষ দরজার সামনে ওয়াতারিদা একজনকে ডেকে জানতে চাইলেন, কেন তাদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে। সে বলল, ভারত সরকার এমনই নির্দেশ দিয়েছে, নইলে তাদের জেলে পাঠানো হবে।

আমরা ভারতে এসেছিলাম, শান্তির জন্য। পরমাণুর বিপদ সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা ভাগ করে নেবার জন্য। জাপানি হিসেবে আমরা জানি, সামরিক এবং শান্তিপূর্ণ — – উভয়দিকেই পরমাণু শক্তি ব্যবহারের কী সমস্যা। ...আমরা এও জানি, তোমাদের দেশ পরমাণু বেনিয়াদের সঙ্গে মিটিং করে, সেখানে পরমাণু বেচতে যারা চায়, তারা রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা নিয়ে আসে। ... তোমাদের সরকার আমাদের ঢুকতে দিল না, কারণ আমরা পরমাণু সম্পর্কে যে মত পোষণ করি, তা তোমাদের সরকারের চেয়ে আলাদা, যা তোমাদের দেশের গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং মুক্ত আলাপের অধিকারের সঙ্গে বেমানান। ...

এফ.ডি.আই-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হকারদের

শ্রীমান চক্রবর্তী, কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর •

আজ বিকেল পাঁচটা থেকে মধ্য কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হকাররা ভারত সরকারের খুচরো ব্যবসায় একশো শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগে ছাড়পত্র দেবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। প্রায় হাজার খানেকেরও বেশি হকার ওয়েলিংটন থেকে মিছিল করে কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগরের মূর্তি পর্যন্ত আসে। মিছিলের মধ্য থেকে তাঁরা স্লোগান দিতে থাকে 'ওয়ালমার্ট গো ব্যাক', 'এফ.ডি.আই গো ব্যাক'।

হকার সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে মুরাদ হোসেন জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে সরাসরি প্রায় পাঁচ কোটি পরিবার এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ব্যাহত হবে প্রায় ২৫ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা। তাঁর মতে উৎপাদন থেকে বিপনন পর্যন্ত দেশীয় যে পরিকাঠামো রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে এক ধরনের স্বনির্ভরতা। সাময়িক সময়ের জন্য প্রাথমিক কিছু সুযোগের লোভ দেখিয়ে তারা চাষি, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ছোটো বিপণিদের হটিয়ে বৃহৎ বিদেশি ব্যবসায়ীরা হাতে সমস্ত বাজারটাকে ছেড়ে দিতে চাইছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার এই নীতি ফিরিয়ে না নিলে তারা পুজোর পর থেকে দেশ জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দেন। প্রয়োজনে তাঁরা জঙ্গি আন্দোলনে নামতে পিছপা হবেন না। হকারদের এই মিছিলে মহিলা হকারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সন্ধ্যেবেলা ওয়েলিংটন থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত এই মিছিলের কারণে বেশ কিছু সময়ের জন্য এই অঞ্চলে যানজটের সৃষ্টি হয়।

কুডানকুলামের আন্দোলনের সংহতিতে জাপানে মিছিল, ১৫ সেপ্টেম্বর

জাতীয় খাদ্য অধিকার যাত্রা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে, ৩০ সেপ্টেম্বর •

২ থেকে ১৫ অক্টোবর জাতীয় খাদ্য অধিকার যাত্রায় শামিল হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, উড়িষ্যার বিভিন্ন অ-সরকারি সংগঠন (এনজিও)। তারা জানিয়েছে, দেশের ৪৩ শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার; ৪০ শতাংশ মহিলা রক্তাল্পতায় ভোগে; দেশের বিভিন্ন স্থানে এখনও অনাহারে মৃত্যুর মিছিল। আমাদের পশ্চিমবঙ্গও এর বাইরে নেই। দিল্লির সরকার খাদ্য নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করতে চাইছে। কিন্তু প্রস্তাবিত বিলে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়, দেশের কৃষি সমস্যা সমাধানের কোনো উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় তারা কয়েকটি দাবি তুলেছে —

১। মজুত করা খাদ্যশস্য অভুক্ত মানুষের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

২। রেশন ব্যবস্থায় চুরি বন্ধ করতে হবে।

৩। জনমুখী খাদ্য নিরাপত্তা আইন করতে হবে।

৪। চাষির কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে তা মজুত ও সংরক্ষণ করতে হবে।

দ্বিতীয় পাতার পর

ফলতা সেজ-এ মজুরি বৃদ্ধি

মজার ব্যাপার হল এদের মধ্যেই একজন আবার তার দাদার চ্যানেল ব্যবহার করে অন্য কোম্পানিতে কাজে ঢুকেছে। তবে যেখানে এই ঘটনার আগে কোম্পানি পার ডে, না ১৪৫ টাকার বেশি দিত, না সেখানে ২৪টা ডিউটিতে ১৬০ দিচ্ছে। আর ২৪টার কম ডিউটিতে ১৪০ করে দিচ্ছে। যারা বাদ গেছে, তাদের মতে, ওয়ার্কাররা যদি একতা হয়ে কারখানায় কাজে না ঢুকত, তাহলেও কোম্পানি বাধ্য হত ১৬০-এর চেয়ে বেশি দিতে। এইসব কথা যখন হচ্ছিল, তখন অন্য কারখানার একজন লেবার বললেন, নেতা ধরতে হয়। কিন্তু তাতে এঁরা বললেন — নেতা ধরে কিছু হবে না।

পত্রিকার পাতা থেকে

৭ অক্টোবর ২০১১ : আইএমটি-মানেসরে এগারোটি কারখানা শ্রমিকদের দখলে

মারুতি সুজুকি মানেসর ডায়েরি (৫)

শের সিং সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'ফরিদাবাদ মজদুর সমাচার' থেকে •

২০১১ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস ছিল মারুতি-সুজুকির মানেসর প্ল্যান্টে মালিক শ্রমিক উভয়পক্ষের প্রস্তুতিপর্ব। শ্রমিকেরা যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে তেমন কিছু না করতে পারে, ম্যানেজমেন্ট তার ব্যবস্থা পাকা করছিল। শ্রমিকদের ওপর ছাঁটাই-সাসপেনশনের আক্রমণ তো ছিলই। তার ওপর পুলিশ-ক্যাম্প বসানো হয়েছিল। ৬০০ একর জায়গার ওপর এই মানেসর ফ্যাকট্রি এতদিন নিচু দেওয়াল আর তারজাল দিয়ে ঘেরা ছিল। অক্টোবর মাসের গোড়ায় চারপাশে উঁচু দেওয়াল তোলা হল। কারখানা এবার দুর্গের চেহারা নিল।

কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে অন্য এক প্রক্রিয়া গড়ে উঠল। গুরগাঁও থেকে ১৭ কিমি দূরে মানেসরের ইন্ডাস্ট্রিয়াল মডেল টাউনশিপ (আইএমটি)। ১২ সেপ্টেম্বর মারুতি সুজুকিতে শ্রমিক-বিক্ষোভের ঢেউ পৌঁছাল এখানকার সেক্টর-৩-এর মুঞ্জাল শোয়া ফ্যাকট্রিতে। স্থায়ী কাজে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের প্রতিবাদে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে দেয়। মুঞ্জাল শোয়ার গুরগাঁও এবং হরিদ্বার ফ্যাকট্রিতেও কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরের দিন মঙ্গলবার রাত আটটার সময় ১৫৫ জন শ্রমিককে কোম্পানি স্থায়ীকরণ করে।

১৪ সেপ্টেম্বর আইএমটি-মানেসরে বিকেল চারটের সময় সুজুকি পাওয়ারটন কাস্টিং ফ্যাকট্রি, সুজুকি পাওয়ারটন ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ইঞ্জিন ফ্যাকট্রি এবং সুজুকি মোটরসাইকেল ফ্যাকট্রির দুই শিফটের শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে ফ্যাকট্রির ভিতরেই বিক্ষোভ শুরু করে। শ্রমিকেরা শ্লোগান দিয়ে বলে : মারুতি সুজুকি মানেসর ফ্যাকট্রির সমস্ত শ্রমিককে কাজে ফিরিয়ে নিতে হবে; গুড কন্ডাক্ট বন্ড হটাতে হবে।

১৫ সেপ্টেম্বর ওই তিন ফ্যাকট্রির বিক্ষোভ চলতে থাকে। মারুতি সুজুকির গেটেও শ্রমিকদের মধ্যে উল্লাস দেখা যায়। তারা শ্লোগান দেয়, বক্তৃতা করে, গান গায় আর প্রচারপত্র বিলি করে। নানারকম আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। সেল অ্যান্ড ডেসপ্যাচ-এর ড্রাইভাররা সি-শিফটে কাজ বন্ধ করে দেয়। ঠিকেদারের অধীনস্থ ৩৫০ জন ড্রাইভার এ এবং বি-শিফটে সেল অ্যান্ড ডেসপ্যাচ গেটের বাইরে জমা হয়, বৃষ্টি উপেক্ষা করে খোলা মাঠে তারা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

১৬ সেপ্টেম্বর সুজুকি পাওয়ারটন কাস্টিং ফ্যাকট্রি, সুজুকি পাওয়ারটন ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ইঞ্জিন ফ্যাকট্রি এবং সুজুকি মোটরসাইকেল ফ্যাকট্রির ম্যানেজমেন্ট শ্রমিকদের আলোচনায় ডাকে। শ্রমিকেরা ম্যানেজমেন্টের অনুরোধে কাজ শুরু করে।

১৮ সেপ্টেম্বর রাতে শ্রম দপ্তরে মারুতি সুজুকির ম্যানেজমেন্ট এবং শ্রমিকদের মধ্যে আলোচনা ভেঙে যায়। সেখান থেকেই পুলিশ তিনজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে। শ্রমিকেরা উত্তেজিত না হয়ে তাদের জামিনের জন্য চেষ্টা করে। ২০ তারিখ তারা ছাড়া পায়।

ওদিকে ট্রেনিদের ফোন করে জানানো হয়েছিল, ১৯ সেপ্টেম্বরে মধ্যে কাজে না এলে বরখাস্ত করে দেওয়া হবে। ২০ তারিখ থেকে টেলিফোনে কোম্পানির সুর পাল্টাতে থাকল। প্রথমে, 'ডিয়ার এমপ্লয়ি ...', তারপর 'মারুতি পরিবারের প্রিয় সাথি', তারপর 'প্রিয় সহকর্মী' সম্বোধন চলতে থাকল। এমনকী শ্রমিকদের গ্রামের বাড়িতেও পৌঁছে গেল ম্যানেজারেরা। বাড়ির লোককে শ্রমিকেরা বলল, 'কিছু জিজ্ঞেস না করে ঠান্ডা এনে সাহেবকে খাইয়ে দাও আর আদর করে বিদেয় করো।' আশপাশের কিছু পঞ্চায়েত-সরপঞ্চকে কোম্পানি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে একত্রিত করল। তাদের দিয়ে শ্রমিকদের বলানো হল, ফ্যাকট্রির ভিতরে ঢোকো, নাহলে এখান থেকে ভাগো। রাতে তাদের মদ খাইয়ে গাড়ি করে এলাকায় ঘোরানো হল। গ্রামে শ্রমিকদের ঘরের ভাড়া বাড়ানো হল। কিন্তু এসবে কোনো ফল হল না।

২৩ সেপ্টেম্বর ইউনিয়নের নেতারা তিনটে বাসে করে শ্রমিকদের নিয়ে মানেসর ফ্যাকট্রির গেটে এল। সুজুকির অন্য ফ্যাকট্রি থেকেও নেতারা এল। বক্তৃতা আর কথাবার্তা হল। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা চালানোর জন্য গুরগাঁও ফ্যাকট্রির নেতাদের দায়িত্ব দেওয়া হল। ৩০ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে একটা লিখিত চুক্তি হল।

চুক্তি অনুযায়ী ৩ অক্টোবর স্থায়ী শ্রমিকেরা কারখানায় প্রবেশ করল। কিন্তু ১২০০ ঠিকা শ্রমিককে কাজে নেওয়া হল না। ৪ ও ৫ তারিখ একইভাবে চলল। দশেরার পর ৭ তারিখ ঠিকা শ্রমিকেরা কারখানার গেটে জমা হল। তাদের ধমকানোর জন্য সেখানে উপস্থিত হল কোম্পানির ভাড়াটে বাউন্সারেরা। একজন সাসপেন্ড স্থায়ী শ্রমিকের সঙ্গে সেই পালোয়ানদের বচসা হল। দ্রুত আইএমটি-মানেসরের তামাম ফ্যাকট্রির শ্রমিকদের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হল। দুপুর একটার সময় মারুতি সুজুকির গেটে সকলে একত্রিত হল। ঠিক হল, বিকেল চারটের সময় এ এবং বি-শিফটের শ্রমিকেরা মিলে কারখানা দখল করে নেবে।

শ্রমিকেরা কারখানা দখল করল। মারুতি সুজুকির সঙ্গে সুজুকি ইঞ্জিন, সুজুকি কাস্টিং, সুজুকি মোটরসাইকেল, সত্যম অটো, বাজাজ মোটর, ইন্ডিওরেন্স হাইলেক্স, লুমেক্স, লুমেক্স ডি কে ডিঘানিয়া-র শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে নিজের নিজের কারখানা দখল করল। দাবি করা হল, মারুতি সুজুকির ১২০০ ঠিকা শ্রমিককে কারখানায় কাজে নিতে হবে। ৭ অক্টোবর বিকেল চারটে থেকে আইএমটি-মানেসরের ১১টি ফ্যাকট্রি দখল করে ধর্মঘট শুরু হল।

চলবে

বেসরকারি হাসপাতালের কু-চিকিৎসা

বিজন কাহালি, জিনজিরাবাজার, কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর •

দক্ষিণ কলকাতার কোঠারি হাসপাতাল চিকিৎসার নামে পেসমেকার মেশিনের বিক্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে।

২০১১ সালের নভেম্বর মাসে আমার পরিচিত শ্রী রবীন্দ্রনাথ সাউ ভর্তি হন এখানে। ওঁকে আইসিইউ-তে রাখা হয়। তারপর তাঁর চিকিৎসার জন্য হলটার মনিটরিং মেশিন লাগানো হয়। তারপর রিপোর্ট দেখে বলা হয়, পেসমেকার এশিন লাগাতেই হবে। অন্তত এবার না লাগালেও আবার যদি একই অসুস্থতা হয়, তাহলে লাগাতেই হবে। উনি বাড়ি চলে আসেন। ২০১২ সালের ৩০ জুলাই ফের উনি কোঠারিতে ভর্তি হন, যথারীতি চালান করা হয় আইসিইউ-তে। এবারও বিভিন্ন টেস্ট করার পর জানিয়ে দেওয়া হয় পেসমেকার লাগাতেই হবে। এক লাখ টাকার প্যাকেজ আছে। ওঁরা বলেন, আমরা আলোচনা করে দেখি কী করা যায়। ওঁর বড়ো ছেলে বলেন, আমরা এখন লাগাব না, সময় চাইছি – — বলে ছুটি নিয়ে আসেন। ৩ আগস্ট তারিখে রবীন্দ্রনাথকে আরেকটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও আইসিইউ-তে ঢোকানো হয়। ওঁর পরীক্ষা হয়, বলা হয়, ওঁর কোনো পেসমেকার দরকার নেই, কারণ ওঁর কোনো হার্টের অসুখই হয়নি! নার্ভের অসুখ। নার্ভের ওষুধ দিয়ে সেখান থেকে তাকে ৯ আগস্ট ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। আপাতত রবীন্দ্রনাথ ভালোই আছেন।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, কোঠারি হাসপাতাল একটি গবেষণা কেন্দ্র বলে নিজেকে দাবি করে, তা কী করে একটি পেসমেকার বিক্রির জন্য তদ্বির করতে পারে!

খবর দিন খবর নিন

BOOK POST/REGISTERED JOURNAL
সংবাদমন্থন ৪ KHOBORER KAGOJ SAMBADMANTHAN (fortnightly) Vol 4 Issue 7 1 October 2012 Rs 2
Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

সুপুর — বোলপুরের কাছে একটি হারিয়ে যাওয়া গ্রাম

দীপংকর সরকার, হালতু, ১৭ সেপ্টেম্বর। সুপুরের জোড়া মন্দিরের ছবি লেখকের তোলা •

এটা খুবই অনুতাপের বিষয় যে, আমরা অনেকেই শান্তিনিকতন যাই মাঝেমধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধের আশ্রম দেখতে, খোয়াইয়ের প্রাকৃতিক রহস্য উদ্‌ঘাটনে। কিন্তু বোলপুরের আশেপাশে হারিয়ে যাওয়া মন্দির স্থাপত্যগুলির খোঁজ আমরা ক–জনই বা রাখি। এমনই হারিয়ে যাওয়া গ্রামের নাম সুপুর ও লাভপুর। প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে স্থান দুটির নাম পরিচিত হলেও সাধারণের কাছে আজও এই গ্রামগুলি অচেনাই থেকে গেছে। কথিত আছে সুপুর ও লাভপুরের কাছে দেবী ফুল্লরার মন্দির হল সতীর একান্ন পীঠের একপীঠ। প্রত্যেক বছর মাঘি পুর্ণিমায় এখানে বড়ো মেলা বসে।

ভোরের ৬–০৫–এর গণদেবতা ধরে বোলপুর স্টেশন, সেখান থেকে চুক্তিবদ্ধ রিক্সায় চেপে রওনা হলাম। বোলপুর স্টেশন থেকে কবি জয়দেব রোড ধরে প্রায় ১৪ কি.মি. ভেতরে অজয় নদীর তীরে সুপুর গ্রাম। রিক্সায় যেতে যেতেই উঁচু নিচু লাল সুরকি বিছানো মাটির রাস্তার দুধারে গ্রামের দৃশ্য সকলেরই চোখ টানে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে রাস্তার পাশে দোতলা তিনতলা মাটির দেওয়ালের বাড়ি তার পাশে চরে বেড়াচ্ছে গরু, মোষ, ছাগল। শান্ত, সমাহিত নিস্তরঙ্গ এই গ্রামের মধ্যেই একদা গত আঠেরো শতকে ঘাঁটি গেড়েছিল ফরাসি বণিকরা।

সুপুরের প্রধান আকর্ষণ এখানকার জোড়া মন্দির। মন্দিরের চারপাশের দেওয়ালে টেরাকোটার নকশা বাংলার অতিপরিচিত শিল্পসত্তাকে মনে করায়। মন্দিরের সামনের দিকে দেবী দুর্গা তার পরিবার সহ বিরাজমান। আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানেই মন্দিরটি সংরক্ষিত। তবে মন্দিরের বহু অংশেই ভগ্ন দশা চোখে পড়ার মতো।

রিক্সা চালক আমাকে জোড় মন্দিরের সামনে এনে দাঁড় করালেন। আমি এক ঘন্টার মধ্যে ঘুরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মন্দির চত্বরের ভিতরে ঢুকলাম। মন্দিরের চারপাশ দেখার পর আমি গ্রামের ভিতরে লাল সুরকীর পথ ধরলাম। ছবিও তোলা হল। এখানে একটু এগিয়ে বাঁদিকে চোখে পড়ল গ্রামের সবথেকে প্রাচীন সুরাটেশ্বর শিব মন্দির। মূল মন্দিরের অংশ নেই বললেই চলে। তবে কিছু ভাঙা স্তম্ভ ও বিগ্রহ আশে পাশে ছড়িয়ে রয়েছে। গ্রামের আরও ভিতরে যেতে যেতে কাঁচা রাস্তার দু–পাশে চোখে পড়ল বেশ কয়েকটি ভাঙা মন্দির। ছবি তুলে রাখলাম মন্দির গুলোর এই ভেবে যে আগামী দিনে হয়তো এগুলিও হারিয়ে যাবে। বাংলার স্থাপত্য শৈলীর এই নিদর্শনগুলি যে ক্রমশ ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছে তা ভাবতে ভাবতেই ফিরে এলাম রিক্সা চালকের গাড়ির সামনে।

বাংলার আনাচেকানাচে এভাবেই ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে বহু প্রাচীন ও মধ্যযুগের স্থাপত্য–ভাস্কর্যের নিদর্শন। যেগুলির অধিকাংশই রয়েছে লোকচক্ষুর আড়ালে এবং উপেক্ষিত। আমার খোঁজ এই উপেক্ষিত পরিত্যক্ত বাংলার হারিয়ে যাওয়া গ্রাম, হারিয়ে যাওয়া শিল্প, আড়ালে থাকা প্রকৃতিকে ঘিরেই। বিষাদগ্রস্ত মনে রিক্সায় বোলপুর স্টেশনে ফিরে বামদেব লোকালে বর্ধমান। সেখান থেকে হাওড়া ফিরলাম।

ইছামতীর ধারে টাকীতে

অমিতাভ সেন, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর •

বেড়াতে গেছিলাম টাকীতে। ইছামতীর ধারে এই পুরোনো শহরটা বেশ সুন্দর। হাসনাবাদের ট্রেনে চেপে টাকী রোড স্টেশনে নেমেই মন ভালো হয়ে গেল। কলকাতার হইচই যেটুকু ট্রেনের ইঞ্জিনের আওয়াজ বয়ে এনেছিল, ট্রেন চলে যেতেই তার সব শেষ। ছিমছাম স্টেশনটা এত চুপচাপ যে লাইনের ওপারে ধানখেতের পাশে খেজুরগাছের ডালে পাখি নড়ার সরসর শব্দ এপারের প্ল্যাটফর্ম থেকে শোনা যাচ্ছে। ওই দেখো পাখি, ওটা কী পাখি — আমাদের চেঁচামেচিতে হলুদ দুটো ডানা মেলে উড়ে গেল পাখিটা — হলুদ বসন্ত।

স্টেশন থেকে ভ্যানে করে নদীর ধারের গেস্ট হাউসে যেতে হবে শহরের অন্য প্রান্তে। যেতে যেতে দেখলাম টাকী শহরের স্কুল–কলেজ, রাস্তা–ঘাট, ঘর–বাড়ি সবই বেশ পরিচ্ছন্ন। ভাদ্রের ভরাপুকুরে শালুক ফুটে রয়েছে চৌমাথার মোড়ে — কোনো মন্ত্রীসান্ত্রীর নির্দেশে নয়, শরতের নির্দেশে। এলা রঙের একতলা বাড়ির পাশ দিয়ে বাঁক নেওয়ার সময়ে নাকে এল মিষ্টি ফুলের গন্ধ। সাদা ছোটো ফুল এক ঝলকে অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে যাত্রীদের মধ্যে বিতর্ক তুলে দিল — জুঁই না হাসনুহানা? মফস্বল শহরে গ্রাম ও নগর দুই–ই পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে চলেছে। পাঁচিলের গায়ে একটানা বিজ্ঞাপনে লেখা আছে — কোথায় ভালো ফার্নিচার পাওয়া যাবে, হনিমুনের জন্য কোথায় যাওয়া ভালো, মাতৃসদনের ঠিকানা আর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের হদিশ। এমনভাবে পরপর সাজানো — দেখে বেশ মজা লাগল, মনে হল, মধ্যবিত্ত জীবনের প্রবাহকে একটা ধারাবাহিকতায় তুলে ধরতেই যেন এইসব লেখা।

ইছামতী নদীর ধারে সরকারি–বেসরকারি অনেকগুলো গেস্ট হাউস আছে। সেখানে কোথায় ঢুকলে দুপুরবেলায় বেজায় খারাপ রান্নাও স্বাদ মারতে পারে না এমন দারুণ ইলিশ পাওয়া যায় এবং সারাদিন ঘরে বসে নদীর ওপারে বাংলাদেশের আবছা গাছপালা আর এপারে ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগ তোলা জেলে নৌকার ঘোরাফেরা দেখে রাতে তাজা চিংড়ির লাল রসা খাওয়া যায়, তার ঠিকানা না দিলেও পেয়ে যাবেন। কারণ ও জায়গাটাই অমনি, অবিশ্যি যদি পকেট ভারি থাকে — তখন সেসব, ওখানে যে সারাক্ষণ নদীর ঢেউয়ের ছলাৎছল আর সারাক্ষণ উড়ালি–বিড়ালি বাও তেমনই স্বাভাবিক, যেমন স্বাভাবিক সীমান্ত এলাকা বলে বগলে বন্দুক উঁচিয়ে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের আনাগোনা, নদীর ধার বরাবর কিছুটা অন্তর ওয়াচ টাওয়ার আর ঝকঝকে স্পীডবোটের ধারালো হেডলাইট।

টাকীতে ঘুরে দেখার জিনিস কী কী আছে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই জেনে যাবেন – ভ্যানওয়ালারাই বলবে 'বাবু, ঘুরতে হলে বলবেন, রাজবাড়ি, নন্দদুলাল মন্দির, গোলপাতার জঙ্গল মিনিসুন্দরবন সব দেখিয়ে দেব ভালো করে।' তারপর মালপত্র নামিয়ে ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে চা খেতে গেলেই মাঝির ছেলের চিকন গলা শোনা যাবে 'ভুটভুটিতে যাবেন — রাজবাড়ি, পিকনিক স্পট, বিএসএফ ক্যাম্প, মাছরাঙ্গা দ্বীপ দেখবে'। ঠিক সেই সময় চার–পাঁচজন গামছাওয়ালা এসে নানা সাইজের গামছা মেলে ধরে বসিরহাটের গামছা বলে বাজারের তুলনায় বেশ কম দাম চাইবে। আপনারাও কেউ কেউ দু–একটা কিনে ফেলবেন– শুধু সস্তা বলে নয়, স্থানীয় হস্তশিল্পকে বাঁচানোর তাগিদেও।

আমরা আটজনের দল ওইসব ভেবেই চারটে গামছা কিনে ফেলেছিলাম। তারপর যে দুদিন ছিলাম তার মধ্যে আরও বার চারেক রাস্তাঘাটে আরও হাফডজন গামছাওয়ালা অনেক পীড়াপীড়ি করেছিল। আমরা তাদের বোঝালাম, গামছা কেনা হয়ে গেছে, এবং শুধু গামছা পরলেই আমাদের চলবে না। সাথে সাথে বুঝলাম এখানকার এই অধিবাসীরা ট্যুরিস্টদের ওপর কতটা নির্ভরশীল।

ঘুরে দেখার যে জায়গাগুলোর কথা বললাম, সেগুলো আমরা দেখেছি একদিন বিকেলে ভুটভুটি নৌকায় চেপে চল্লিশ মিনিটের নৌকা ভ্রমণে। উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে বসে দূরে তীরের দিকে আঙ্গুল তুলে তুলে মাঝির ছেলে সবই দেখালো যা সে বলেছিল। আমরা তা দেখলাম আর তার চেয়েও ভালো দেখলাম ছেলেটার গাইড হওয়ার সম্ভাবনা। মোটরের প্রচণ্ড আওয়াজের মধ্যেই সে চেঁচিয়ে জানালো তার নাম বাপ্পা মণ্ডল। কোন ক্লাসে পড়ে জিজ্ঞেস করায় এক হাতের পাঁচ আঙ্গুল আরেক হাতের তর্জনী তুলে জানালো ছয় ক্লাস। ছুটির দিনে এইভাবে দশ–বিশ টাকা সে পেয়ে যায় ট্যুরিস্টবাবুদের কাছ থেকে। নদীর পেটের মধ্যে নৌকার খোলের ভেতরে বসে বাইরে কাঁধের উচ্চতায় জলের স্রোত বয়ে যেতে দেখে গা ছমছম করে। পাশ দিয়ে ভেসে যাওয়া মরা গরুর পেটফোলা লাশ, পারের বাঁধের ভাঙ্গা অংশে জলের খলখলানি গা শিরশির ভাবটা আরও বাড়িয়ে দেয়। অনেকটা উঁচু পারের ওপর কেয়ার ঝোপ আর ইঁটভাঁটার চিমনি আমাদেরকে ঘাটের পথ দেখিয়ে দেয়। সন্ধ্যের ঝোঁকে ঘাটে নেমে কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা সরে না। বিকেলের ম্লান আলো ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে কেমন একটা বিষাদের আবহ তৈরি করে।

পরদিন সকালে গেছিলাম মিনি সুন্দরবন। নিয়ে গেল দেবদাস আর লাদেন। দেবদাস মানে দেবদাস মণ্ডল — দেবদাস বলে ওরা রাজবংশী জেলে। আর লাদেনের আসল নাম শাহিন। ওকে দেবদাস লাদেন বলে ডাকে। ১২–১৩ বছরের বাচ্চা ছেলে শাহিনকে ভ্যানওয়ালা থেকে ওখানকার দোকানদারেরা সকলেই লাদেন বলে ডাকে, ও তাতেই হাসিমুখে সাড়া দেয়। কালো পাথরের মতো শক্ত চেহারার যুবক দেবদাস লাদেনকে স্নেহ করে। ওকে ডেকে নেয় আমাদের দুটো গাড়ি লাগবে বলে। গাড়ি চালাতে চালাতেই সে জানায়, 'জানেন, লাদেনের চার চারটে দাদা বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। তারপরে ও, ওর নিচে আর এক ভাই, আর বিধবা মা। মা বাইরের কাজ করতে পারে না। ও তাই পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে ভ্যান রিকশা চালাচ্ছে। ওর পয়সাতেই ওদের সংসারটা চলছে।'

আর তোমার সংসার? দেবদাস বলে, 'আমার বউ, দুটো বাচ্চা। বড়ো মেয়ে থ্রিতে পড়ে টাকী গার্লস স্কুলে। ছোটো ছেলে ওয়ানে। নিজেদের পাঁচ বিঘে জমি ছিল। ধানি জমি। বোনের বিয়ে দিতে গিয়ে বাবাকে সে জমি বেচে দিতে হল। বাবার দোষ ছিল না। আমি তো ঠিক সুবিধের ছিলাম না। কম বয়সে খালি উড়ে বেড়াতাম। বাবা–মা ডাকলেও ঘরে যেতাম না। এখন ১১কাঠার ভিটে বাড়ি এই কাছেই। ছোটো ভাইটা এমব্রয়ডারির কাজ করে, ওর রোজগারপাতি খারাপ না। আমি তো এই ভ্যান চালাচ্ছি। মাথা পিছু ৪০ টাকা করে আপনাদের এই ৪ জন সওয়ারির থেকে ১৬০ টাকা, আরও দু–একটা স্টেশনে যাওয়ার ভাড়া পেলে ২০০/২৫০ টাকা হবে। অফ সিজনে এর বেশি হয় না। পুজোর থেকে সিজন শুরু হবে। চলবে শীতকাল পর্যন্ত। তখন এরকম ট্যুরিস্ট ট্রিপ পাওয়া যায় অনেক — কিন্তু তিন–চারটের বেশি টানা যায় না। দেখছেন তো কতটা রাস্তা।' দেখলাম সত্যিই খুব খাটনির কাজ। যাতায়াতে প্রায় পৌনে ২ ঘন্টা ভ্যানগাড়ি চলেছে। *চলবে*

খবরে দুনিয়া

যত দ্রুত সম্ভব পরমাণু বিদ্যুৎ–মুক্ত হবে দেশ, জানালো জাপান

শমীক সরকার, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর, গত ১৬ জুলাই ২ লক্ষ মানুষের এক ঐতিহাসিক পরমাণু বিরোধী জনসমাবেশের ছবি, রয়টার •

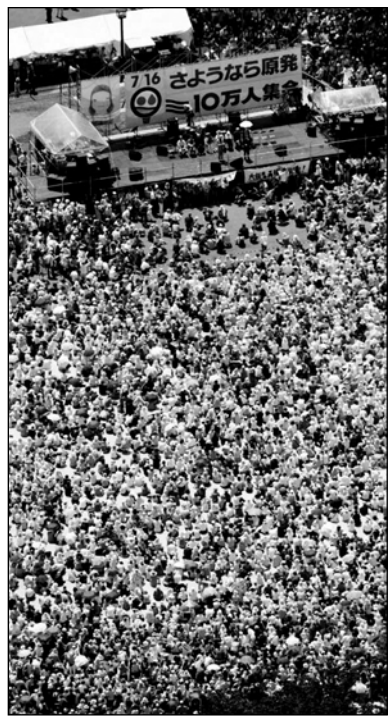

২০১১ সালের ১১ মার্চ ফুকুশিমা বিপর্যয়ের পর দেশজোড়া আন্দোলনের জেরে প্রায় সমস্ত পরমাণু চুল্লি বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু শক্তিশালী পরমাণু লবি চাপ দিয়ে চলেছে, সেগুলি চালু করার জন্য। সেই চাপের কারণেই ৬ সেপ্টেম্বর জাপানের শাসক দল 'গণতান্ত্রিক পার্টি' সিদ্ধান্ত নিয়েও ঘোষণা করতে পারেনি পরমাণু বিদ্যুতের পথ থেকে পাকাপাকিভাবে সরে আসার সিদ্ধান্ত। শাসক দলের সিদ্ধান্ত ছিল, '২০৩০ এর দশকের মধ্যেই পরমাণু–শূন্য জাপান তৈরির জন্য সমস্ত ধরনের নীতি প্রণয়ন এবং সম্পাদের ব্যবহার'।

অবশেষে শুক্রবার জানিয়ে দিল সরকার, যত দ্রুত সম্ভব পরমাণু–শূন্য করা হবে জাপান। তবে কয়েকটি চুল্লি তার পরেও জ্বালিয়ে রাখা হতে পারে, কেবল 'পরমাণু জ্বালানি চক্র'কে সচল রাখার জন্য। প্রসঙ্গত, পরমাণু জ্বালানি চক্রকে সচল রাখার দরকার পরে পরমাণু বোমার মালমশলা এবং পরমাণু চিকিৎসার জন্য। যদিও জাপান পরমাণু বোমা বানায় না। এই দেশটা পৃথিবীর একমাত্র পরমাণু বোমা বিস্ফোরণে ধ্বংসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। তারপর যারা তাদের ওপর বোমা ফেলেছিল, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যেই তারা পরমাণু বিদ্যুতে বলীয়ান হয়ে ওঠে, দেশের তিরিশ শতাংশ বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করছিল পরমাণু বিদ্যুৎ। কিন্তু গত বছরের মার্চ মাসের পরমাণু বিপর্যয় ফের দেশটাকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাওতো কান পরে বলেছিলেন, একসময় তাঁর মনে হয়েছিল, 'হয়তো জাপানেরই আর অস্তিত্ব থাকবে না।' এবার পরমাণু বিদ্যুতের পথ থেকে সরে আসার কথা ঘোষণা করার ঠিক আগে দেশের প্রভাবশালী শিল্পগোষ্ঠীগুলি এবং পরমাণু লবি ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকেও চাপ আসতে থাকে, এমনই জানিয়েছে জাপানি দৈনিক 'মাইনচি'।

প্রসঙ্গত, জাপানের পরমাণু বিরোধী আন্দোলন এক অভিনব পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। একদিকে দেশে চলছে বিদ্যুৎ সংরক্ষণ অভিযান। দেশের সরকার সেই অভিযানে মদত দিচ্ছে। বানানো হচ্ছে সৌর বিদ্যুৎ ও বায়ু বিদ্যুতের পরিকাঠামো। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে সাপ্তাহিক ধরনায় শামিল হচ্ছে হাজার হাজার জাপানবাসী। এই সপ্তাহের ধরনায় সেখানে কুডানকুলামের মৎস্যজীবীদের প্রতি সংহতি জানানো হয়েছে।

পথ করো বাঁধাই–মুক্ত

কংক্রিট তুলে ফেলে মাটি ফিরিয়ে আনার ডাক

গর্গ চ্যাটার্জি, কেমব্রিজ, ১৭ সেপ্টেম্বর •

এই দুনিয়ায় চেনা ছবি দেখতে দেখতে সৌন্দর্যের ধ্যানধারণা বদলে যায়। বদলে যায় বলেই, মাটিতে গাছের থেকেও টবে গাছের একটা আলাদা নান্দনিকতা দেখতে শিখি, সেই টব মাটির হোক বা প্লাস্টিকের হোক। আস্তে আস্তে বুঝতে শিখি মাটির রাস্তা মানেই এঁদো, পাকা ফুটপাথ হল প্রগতি, বাঁধাই করা জমি, যেখানে কংক্রিট দেখা যাবে, মাটি থাকবে না, সেটার একটা সৌন্দর্য অনেকের মতোই আমি শিখেছি। সৌন্দর্যবোধের ব্যাপারটা কিন্তু ভয়ানক, কারণ আমি যাকে সুন্দর মনে করি, তা যদি আদতে ক্ষতিকারক হয়, তাহলে ক্ষতি জানলেও, আচরণ বদলানো শক্ত হয়। যেমন আফ্রিকায় কালো মানুষের শ্রম লুঠের মাধ্যমে উত্তোলন করা হিরে। আমরা অনেকেই জানি সেটা, কত দেশ উজাড় করা এর মুনাফা আসে কিছু মানুষের কাছে, কিন্তু তার ফলে মানসিকতা বদলায় না। হীরের জাজ্বল্য, তা দেখে চকিত হওয়া বদলায় না। এ এমন এক বন্দিদশা, যেখানে আমরা স্বেছায় বন্দি, এটা জেনেশুনে যে, এই বন্দিদশায় আমার ক্ষতি, কিন্তু কারাগারের ভেতরটার প্রতি এমন অমোঘ টান তৈরি হয়েছে, যে বেরোতেও পারি না। এটা ভাববার বিষয়। ফিরে আসি কংক্রিট ও ফুটপাথ প্রসঙ্গে।

যে কেমব্রিজ শহরের সমবায়ে থাকি সেখানে কয়েক বছর আগে স্থানীয় একজন মানুষ এসে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। তিনি ভূ–গর্ভস্থ জলের স্তর নিয়ে চিন্তিত এবং তাই নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো ও জনমত সংগঠিত করেন। তখনই আস্তে আস্তে জেনেছিলাম যে, সুন্দর দেখতে সিমেন্টে বাঁধানো যে রাস্তা, ফুটপাথ, ইত্যাদি দিয়ে প্রাকৃতিক মাটি ঢেকে দেওয়া হয়, তার ফলে বৃষ্টির জল মাটির নিচে পৌঁছোতে পারে না, বয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে মাটির তলায় জলের যে স্তর তা নামতে থাকে, যে ভাণ্ডার তা আস্তে আস্তে নিঃশেষিত হয়। ভারতবর্ষের মতো দেশ, যেখানে জল এত অপ্রতুল এবং 'জল ধরো, জল ভরো' ধরনের গালভরা স্লোগান দেওয়া হয়, সেখানেও একই ব্যাপার।

মার্কিন দেশ প্রাকৃতিক দিক থেকে বেশ ধনী। কিন্তু সেখানেও এই কেমব্রিজ শহরের এক বাসিন্দার থেকে এক ই–মেল পেলাম। সেই ই–মেল এল এক ঝলক নির্মল বাতাসের মতো। এই ব্যক্তি 'depave the way' বা 'পথ করো বাঁধাই–মুক্ত' নামের আন্দোলনের অংশ। এরা বাঁধাই করা নানা জায়গাকে বাঁধাই–মুক্ত করতে চান। বিশেষত এমন সব জায়গা, যেগুলি বাঁধাই করার তেমন কোনো সুবিধে নেই। যথা, বাড়ির আশপাশ, গ্যারাজ থেকে পিচ রাস্তা অবধি গাড়িপথ। এই ধরনের জিনিস সমাজ, বিকল্প, ভবিষ্যৎ, পরিবেশ, সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমাদের নানা ধারণাকে একদম উলটে দেয়। এই বাঁধাই মুক্ত করার এক অনুষ্ঠানে তারা আমায় ডেকেছে। একজনের বাড়ির কিছু অংশ বাঁধাই মুক্ত করা হবে, বাড়ির মালিকদের সহযোগিতায়। করবে কারা? যাঁরা ওখানে পৌঁছাবেন, সকলে। তাঁরা হাত লাগাবেন, সবাই একটু রেঁধে আনবেন, দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে খাটবেন, গল্প–আনন্দ করবেন, নতুন বন্ধু বানাবেন। সমমনোভাবাপন্ন মানুষের সাথে মিলবেন। দিনের শেষে ম্যাপল অ্যাভিনিউ–এর এই অংশটি হবে অ্যাসফল্ট মুক্ত। এই নিমন্ত্রণ আমাকে ভাবিয়ে তুলল, তাই পাঠকদের সাথে ভাগ করে নিলাম।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi, B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18.